দৈব ও পুরুষকার

স্বামী সুহিতানন্দ

উপনিষদে আছে, ''তচ্ছৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।'' অর্থাৎ ভগবান জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। গীতাতেও আছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রও তিনি, ক্ষেত্রজ্ঞও তিনি। পুরুষসূক্ত বলছে ভগবান নিজেকে বিস্তার করলেন—চতুর্দশ ভুবন, জীব, জীবন, ভোগ, মুক্তি সবই তিনি নিজেই হলেন। কীভাবে সৃষ্টি করলেন? মায়া বা অজ্ঞান অবলম্বনে। প্রথমে বিদ্যামায়া অবলম্বনে নিজেকে বহু করলেন; সকলে আমি-আমি করতে লাগল। তখন অবিদ্যামায়ার সাহায্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণ তৈরি হল। তিনগুণ মিলে বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহ এবং পঞ্চভূত—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম তৈরি হল। প্রতিটি 'আমি' এদের সাহায্যে চতুর্দশ ভুবন ভোগ করতে লাগল।

যেহেতু প্রতি আমি সমষ্টি-আমির সত্তা তাই প্রতি আমি ভাবে 'আমি সব', যেমন যে-পরিবারে আমরা জন্মাই সেই পরিবারকে সেই বংশকে আমার মনে করি। যেমন আগুনের ফিনকির মধ্যে আগুনের সব ধর্ম ও ক্ষমতা থাকে। তাই প্রত্যেক 'আমি' ভাবে আমি স্বাধীন এবং যা খুশি করতে পারি।

আজ সকালে বেড়াতে বেড়াতে মনে হল 'দৈব ও পুরুষকার' চিন্তাটা লিখে ফেলব। ঘরে এসেই দেখি নাপিত অপেক্ষা করছে—একটু আগে এসে পড়েছে, তার কী কাজের তাড়া আছে। তাকে attend করতে হল। ফলে যে-সময়ে লিখব ভেবেছিলাম সেই সময়টি পার হয়ে গেল এবং অন্য কাজে লাগতে হল। আমার পুরুষকার বলছে 'লিখে ফেলো' অথচ দৈব কোথা থেকে এসে সব তালগোল পাকিয়ে দিল।

আমাদের জীবনে দৈবও একটি অতি আবশ্যিক বিষয়। আমি জানি না জন্মের আগে কোথায় কীভাবে ছিলাম, জানি না শরীর ছাড়লে কোথায় যাব, কেমন থাকব। জানি না প্রতি কাজের সঙ্গে একটা uncertainty ও probability কাজ করছে। সব ঠিক চলছে, হঠাৎ কিছু ঘটে গেল। সেখানে আমরা অসহায়। যেকোনও সময় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাহলে কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? তা পারব না। আমার প্রকৃতিতেই আমাকে কাজ করাবে। ''কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যসি হ্যবশোঽপি তৎ।''

অন্যতম সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

এই paradoxই জীবন। করলে সফল হতে পার, বিফল হতে পার—তথাপি করতে হবে।

যখন 'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'—স্বভাব আমাকে স্থির থাকতে দেবে না, তখন একটাই উপায়—কিছু করা। কী করব? যাঁরা জীবনে সফল হয়েছেন তাঁদের পথ ধরব। দু-প্রকারের সফলতা আছে। প্রথম, মনবুদ্ধিকে সবল করে জগতের ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করা—অন্যের ক্ষতি না করে। অনেকে এভাবে জীবন সফল করেছেন। এরই মধ্যে একশ্রেণির মানুষ আছেন যাঁদের এই জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে—এই জীবনেই হোক বা গতজন্মেই হোক (গতজন্মে হলে তাঁরা জন্মান্তরীণ সংস্কার নিয়ে আসেন)—তাঁরা জগতের বিষয়ভোগে রস পান না। তাঁরা আদর্শকেই জীবন ভাবেন। আদর্শ দেশ হতে পারে, গ্রাম হতে পারে, বিজ্ঞান হতে পারে, মানবসেবা হতে পারে। আর দ্বিতীয়, যার সব ভোগ শেষ হয়েছে ভোগত্যাগেই তার সুখ। সেটাই তার আদর্শ।

আদর্শ চরিত্রের নিদর্শন আমরা পাই শ্রীরামচন্দ্র চরিত্রে। জাগতিক শক্তিতে তিনি অপরাজেয়, মনুষ্যোচিত শুভগুণের তিনি পরাকাষ্ঠা অথচ তাঁর জীবন কী বেদনাময়! তিনি কী অন্যায় করেছিলেন, কী পাপ করেছিলেন, কোথায় কাকে কষ্ট দিয়েছেন যে কর্মফলরূপে তাঁকে এই যাতনাময় জীবন যাপন করতে হল? কৈকেয়ীর অন্ধ সন্তানস্নেহের জন্য, দশরথের চরিত্রের দুর্বলতার জন্য কেন তাঁকে 'বলি' হতে হল? কেন বনবাস, কেন সীতাবর্জন, কেন লক্ষ্মণকে ত্যাগ, কেন সরযূতে আত্মবিসর্জন? কেন লক্ষ্মণের ও সীতার এত আত্মবিলয়?

এত প্রবল পুরুষকারের অধিকারী হয়েও রামচন্দ্র পদে পদে দৈবের ঘটনাপ্রবাহের কাছে অসহায়। শক্তি থেকেও শক্তিপ্রয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কেন? জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের নিরিখে কোনই সদুত্তর পাওয়া যাবে না। নিষ্ঠুর মহামায়ার হাতে তিনি খেলনার মতো অসহায়। মহামায়ার যদি এমনই বিচার হয় তবে কেন মানুষ পুরুষকার দ্বারা নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা করবে? মানুষ উদ্যমহীন হয়ে নিজেকে প্রকৃতির হাতে সঁপে দিলেই তো শান্তি! না, তাতেও শান্তি নেই।

যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণ উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেই হবে। এ-ব্যাপারেও মানুষ অসহায় ক্রীড়নক। উপায় কী? উদ্দেশ্যই বা কী? শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা হল, ঈশ্বর খারাপ লোক কেন করেছেন? তিনি বললেন, ভাল লোক করবেন বলে। যারা খারাপ কাজ করবে না তারাই ভাল হবে।

পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ ছিল, আছে এবং থাকবে। কেন তাদের কথা কেউ মনে করে না? আর কেন রাম আজও কোটি কোটি হৃদয়ের দেবতা?—কারণ তাঁর আদর্শের জন্য সর্বস্বত্যাগ। মহামায়ার শত ভ্রূকুটিকে তাচ্ছিল্য করার শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল—তাই তিনি মহান।

তাই দৈব অধিক শক্তিশালী হলেও আত্মশক্তিতে পুরুষকারযুক্ত মানব অনেক বড়—কোনও অস্ত্রই তার মহিমাকে ম্লান করতে পারে না। তাই সাবিত্রী আত্মশক্তিতে যমরাজার শক্তিকে পরাভূত করতে পেরেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষকারের শক্তিতে সমাজে তখনই ঈশ্বরতুল্য অমিতশক্তিধর অজেয় পুরুষ। অথচ দৈবের প্রেরণায় তাঁর পিতামাতা কারারুদ্ধ। শৈশবে তিনি পরের দ্বারা পালিত। রাজপুত্র হয়েও গোপকুলে লালিত। নিত্য মৃত্যুভয়, অত্যাচার। কংসবধের পর মনে হল তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। না, তখন ধর্মের অপপ্রয়োগে সমাজ জীর্ণ—সাধারণ মানুষ অসহায়। প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজকুল উদীয়মান শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে নির্মূল করতে সর্বশক্তির প্রয়োগে তৎপর।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রচনা করল শুভশক্তির জয়।

পঞ্চপাণ্ডবের জীবনও যেন paradox। বীরত্ব, শিক্ষাদীক্ষা, পৌরুষ—সর্বত্রই ভীমার্জুন অজেয়। তবু, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পাশে পাশে থাকলেও তাঁরা শক্তিপ্রয়োগে অসহায়, দৈবই প্রধান। দৈবের হাতে পুরুষকার ক্রীড়নক মাত্র। দৈব অনুকূল হলে পুরুষকার সফল, দৈব প্রতিকূল হলে পুরুষকার বিফল।

কিন্তু এই মহান চরিত্রগণ সফলতা বা বিফলতার মাপকাঠিতে চিহ্নিত হন না। তাঁদের চরিত্রের প্রধান বিষয় তাঁদের আদর্শ—সেই আদর্শের কাছে সফলতা-বিফলতা গৌণ। পঞ্চপাণ্ডব ধর্মপথের পথিক। রাম সত্যাচরণের প্রতীক।

ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, বুদ্ধকেও কত জন্ম চেষ্টা করতে হয়েছে। বুদ্ধের মনে ত্যাগ ও জিজ্ঞাসা কিন্তু পরিবেশ প্রতিকূল—তাই অসীম মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে সত্য উপলব্ধি করতে হয়েছে। মারের প্রলোভন জয়ই তো বুদ্ধের চরিত্রের মহিমা।

আচার্য শংকরকেও প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধেই সত্যসন্ধানে আসতে হয়েছে। শ্রীচৈতন্যকেও তাই।

তবে এঁদের সংগ্রাম বেশিরভাগই মানসিক। তাই পরিবেশের থেকেও ব্যক্তিগত জীবনে সংগ্রামের তীব্রতা প্রবল।

বুদ্ধ, যিশু, শংকর, চৈতন্য সকলের ক্ষেত্রেই দৈব তেমন প্রতিকূল বলে মনে হয় না কারণ তাঁরা সংসারে নিস্পৃহ, কেবল ঈশ্বরসত্তাতেই তাঁদের আগ্রহ। তাই প্রতি মুহূর্তে তাঁদের মনকে উচ্চগ্রামে রাখতে হয়েছে। তবেই জগৎ জগদ্‌গুরুকে পেয়েছে। ভগবান যিশু যেহেতু বিপরীত পরিবেশে ছিলেন, দৈব তাঁকে গ্রাস করে নিল; তথাপি সহস্র বৎসর ধরে তিনি সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়ের দেবতা কেন? কারণ তাঁর মানসিক শক্তি। নিজ আদর্শকে তিনি দৈবের কাছে বলি দেননি।

বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামকে সত্যপালনের অপরাধে দৈবের হাতে নির্মম আঘাত পেতে হয়েছে। তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন ঈশ্বরসত্তাতে অবস্থান ছাড়া তাঁর আর কোনও গতি নেই—যদি তিনি সত্যকে ধরে থাকতে চান।

নরেন্দ্রনাথের জীবনে জাগতিক ঐশ্বর্য ছিল, এবং প্রকাশের সুযোগও ছিল; তথাপি পরিবেশ প্রতিকূল। প্রথম পিতার দেহত্যাগ, দ্বিতীয় কোনও চাকরি না পাওয়া, তৃতীয় বৈরাগ্যের তাড়না। পরস্পর বিপরীতমুখী আবেগের তাড়নায় তিনি ক্ষতবিক্ষত।

কিন্তু সবকিছুর শেষে আমরা দেখি, তাঁর দৈব প্রতিকূল বা অনুকূল যা-ই হোক না কেন, তিনি তাঁর লক্ষ্যে অচঞ্চল। ঈশ্বরলাভ না হওয়া পর্যন্ত, জগতকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাওয়ার সোজা পথ তৈরি না করা পর্যন্ত তিনি শান্ত হতে পারেননি। যখন দেখলেন তিনি ঈশ্বরলাভ এবং অভ্যুদয়ের একত্র সমাবেশে এক নূতন সেবামার্গ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তখনই তিনি স্বেচ্ছায় মহানির্বাণ গ্রহণ করলেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জগতে অভ্যুদয়ের পথে দৈব একটি প্রতিবন্ধক শক্তি বটে, কিন্তু সংগ্রামের মাধ্যমেই অভ্যুদয় সম্ভব এবং এই সংগ্রামের ফলে বোধোদয় হয় যে দৈবের সঙ্গে অকারণ সংগ্রাম করে নিজেকে নাশ করার কোনও অর্থ হয় না; নিজেকে পেতে হলে ভগবানের পথে চলতেই হবে। স্বেচ্ছায় গেলে তুমি আনন্দে যাবে—না হলে জগৎ তোমাকে লাথি-ঝাঁটা মারতে মারতে ভগবানের দরজায় ঠেলে ফেলে দেবে।

তাই, 'ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো'। ✠